Study Material for for 2nd Semester GE-2

Paper – GE2T

Topic: Science and Empire

Introduction of Western Science and Medicine

ভারতেবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল শুরু হওয়ার সময় ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদির চর্চা প্রথমিক পর্যায়ে ছিল। লন্ডন থেকে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেকটরস্ বা পরিচালক সভা ভারতে বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নীতি নির্ধারণ করত। ভারতে নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার বিষয়ে অতিরিক্ত সচেতন থাকায় কোম্পানি এখানে ইউরোপীয়দের আগমন ও বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ অনুসরণের বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করত। ১৮৪৮-৫০ খ্রিষ্টাব্দে Joseph Daltor Hooker, উনিশ শতকীয় ব্রিটেনের প্রথম সারির উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ভারতে যে বৈজ্ঞানিক অভিযান অধিগ্রহণ করেন তা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য।

বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপে সামগ্রিক অর্থে কোম্পানির উৎসাহের অভাবের জন্য বহু বিজ্ঞানী কোর্ট অফ ডিরেকটরস্ এর সমালোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে যতটুকু আগ্রহ কোম্পানি দেখিয়েছিল তার পশ্চাতে প্রধান কারণ ছিল বাণিজ্যিক তথা অর্থনৈতিক। ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে কোর্ট অফ ডিরেকটরস্ এর পক্ষ থেকে Francis Buchanan কে পূর্বভারতে সমীক্ষা চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশ এবং বিহারের প্রত্যেক জেলার ভৌগোলিক পরিচয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদ — বিশেষতঃ ভূমি, সমতল, পাহাড়পর্বত, নদীনালা, বন্দর, শহর, মহকুমা এবং একই সঙ্গে জলবায়ু, ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার। তাঁকে ওই স্থানের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষতঃ প্রাণীসম্পদের প্রকৃতি, শাকসব্জী, খনিজ পদার্থ বিশেষতঃ যেসমস্ত দ্রব্য খাবার বা ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ব্যবসা বাণিজ্য ও কারিগরী উৎপাদনের কাজে লাগে তাছাড়া মাছ এর চাষ যেখানে হয় এবং খনি ইত্যাদি যেখানে আছে সেই সব বিষয়ে তাঁকে তদন্ত করতে বলা হয়েছিল। কৃষিব্যবস্থার দিকেও তাঁকে লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল — যেমন উৎপাদিত শস্য, চাষের যন্ত্রপাতি, গবাদি পশু থেকে শুরু করে কৃষিজমির অবস্থা ইত্যাদি। এছাড়াও পূর্বভারত অঞ্চলের অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পোৎপাদন এ সবকিছু সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সর্বোপরি তাঁর উপরে দায়িত্ব ছিল যে কোন প্রয়োজনীয়, নতুন ধরনের গাছপালা বা বীজ ইত্যাদির সন্ধান পেলে কোম্পানির বোট্যানিক্যাল গার্ডেনের অধিকর্তাদের কাছে সে সম্বন্ধে জানানোর।

Buchanon বা এরকম দু-একজনের উদাহরণ থাকলেও কোম্পানি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী বিশেষ কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। মাঝে মধ্যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনে কোম্পানি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে উৎসাহ প্রদান করলেও তা ছিল গৌণ।

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪) — যদিও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল না — তবুও লন্ডনে যেমন ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে Geological Society প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল সেধরনের বিশেষজ্ঞ সংস্থা এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে এশিয়াটিক সোসাইটি ভারতবর্ষে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস এর প্রতিষ্ঠা (১৯১৪) না হওয়া পর্যন্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার মূল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছিল। ১৭৮৮ থেকে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সোসাইটির পত্রিকা 'Asiatic Rerearches' এ প্রায়শই বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।

বৈজ্ঞানিক আলোচনাকে আরও বেশি করে অনুপ্রাণিত করার জন্য ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে একটি কমিটি স্থাপিত হয়েছিল যার উদ্দেশ্য ছিল "to promote the Knowledge of natural history, philosophy, medicine, improvements of the arts and sciences, and whatever is comprehended in the general term physics".

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই সরকারি উদ্যোগে এদেশে প্রজাদের সুখ সুবিধের উন্নতির জন্যে ব্যারাকপুরে একটি খামার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ইউরোপীয় কৃষি বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও ব্যবহারিক দিকে অভিজ্ঞ একজন স্থপতিকে এই কাজে লাগানোর প্রস্তাব করা হয়েছিল।

১৮২০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় উইলিয়ম কেরির উদ্যোগে 'ভারতীয় কৃষি সমাজ' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। ওই সভার পক্ষ থেকে ভারতীয় কৃষির উন্নতি সাধনের জন্যে দেশের বিভিন্ন অংশের কৃষি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করা, সার, পর্যায়ক্রমে চাষ, সেচ ইত্যাদির সাহায্যে জমির উন্নতি সাধন, নূতন এবং প্রয়োজনীয় বৃক্ষরোপন, কৃষিকাজ-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধন, গোরু, ভেড়া ইত্যাদির উন্নতিসাধন, এবং অনাবাদী জমির চাষ আবাদ করার ব্যবস্থা করা হয়।

সরকারকে এ-দেশের কৃষি অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করার জন্যে বেসরকারিভাবে ১৮২৯ সালে একটি কৃষি-বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। দেশীয় ব্যক্তিরা ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে মিলেমিশে অথবা এককভাবে যাতে সেখানে কাজ করতে পারে, তার কথাও সেই প্রস্তাবে উল্লেখ ছিল। ১৮৩১ সালে "হিন্দুস্থানের ক্ষেত্র ও বাগানের কৃষি সমাজের কৃতকর্ম্মের বিবরণ পুস্তক" নামে এই সমাজের কার্যাবলী প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮২২ সালের ২ মার্চ কৃষি সমাজের এক সভায় কেরি এই সমাজের কার্যাবলী ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দুস্থানীতে প্রকাশ করার প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী ১৮২৯ সালের ২১ অক্টোবরের সভায় সমাজের কাজের কিছুটা বাংলায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ১৮৩১ সালে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে তা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৩৫ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক ওই সমিতির সভায় এক ভাষণ দেন। তিনি অন্যান্য ভারতীয় বিজ্ঞানের মত কৃষি বিজ্ঞানের অবস্থাও অতি শোচনীয় বলে উল্লেখ করেন। ভারতীয় ব্যবস্থার যে কোন দিকে তাকালে একই চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় — তা হল দারিদ্র্য, নীচতা ও দীনতা। ও সবের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে জ্ঞানের প্রসারই একমাত্র পথ। দেশের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট খামার স্থাপন করে সেখান থেকে উন্নতমানের বীজ ও চারাগাছ বিতরণের পরামর্শ দেন।

১৮৪৭ এর গোড়ার দিকে ভারতীয় কৃষি সমাজের উদ্যান বিষয়ক কমিটি মালিদের শিক্ষা দেবার জন্য একটি স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করে। ১৮৪৭ সালের ১৬ মার্চের কৃষি সমাজের সভায় সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। দুঃখের বিষয় ওই স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত মালিরা কলকাতা থেকে দূরে যেতে অস্বীকার করত। ওই বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়সের সীমা ছিল ১২ থেকে ১৫ বছর। এখানে শিক্ষালাভ করে অনেকেই মালির কাজ ছেড়ে দিয়ে সরকারের কাজে যোগ দিত।

১৮৪৭ সালের ৩ জুলাই সরকারের বাবস্থাপনায় 'বোটানিক গার্ডেনে' ডাঃ ম্যাকক্লিল্যান্ডের (Mcclelland) অধীনে ওই রকম আরেকটি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে মালিদের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হত। তারা দিনে ৬ ঘন্টা লেখাপড়া করত এবং ৫ ঘন্টা বাগানের কাজ করত।

কৃষি সমাজের স্কুলের মত এ স্কুলের ছাত্রদের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল, ছেলেদের পড়ানোর সুযোগ পেয়ে বোটানিক গার্ডেনের মালিরা কৃতজ্ঞ বোধ করবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল সামান্য ইংরেজি লিখতে শিখলেই এরা নতুন চাকরীর খোঁজ করতে থাকে।

১৮৫০ সনে কৃষি সমাজ তার বার্ষিক কার্যবিবরণী বাংলায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আগস্ট মাসে একটি স্থায়ী অনুবাদক সমিতি গঠিত হয়। Indian Miscellrmy নামে বাংলা ভাষায় সমিতির রচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৮৫৪ সালে এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

উনিশ শতকের বাংলায় সর্বপ্রথম পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে সমগ্র ভারতে সরকারি ভাবে এর প্রচলন ঘটলেও এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রকৃত সূত্রপাত হয়েছিল কয়েক শতাব্দী আগে ভারতে ইউরোপীয়দের আগমনের মধ্যে দিয়ে। ব্যবসাবাণিজ্য, পর্যটন, ধর্মপ্রচার এবং উপনিবেশ বিস্তারের প্রয়োজনে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে একে একে পর্তুগিজ (১৪৯৮ খ্রিঃ) ওলন্দাজ (১৫৯৬ খ্রিঃ), ইংরেজ (১৬০০ খ্রিঃ), ডেনিসিয়ান (১৬১৬ খ্রিঃ) ও ফরাসীরা (১৬৪০খ্রিঃ) ভারতে এসে উপস্থিত হলে তাদের মাধ্যমে এদেশে পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের আমদানী ঘটে। ভারতে পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রথম নিয়ে আসার কৃতিত্ব ভারতীয় উপকূলে প্রথম অবতরণকারী পর্তুগিজদের।

১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে আলবুকার্ক গোয়া অধিকার করে সেখানে একটি 'রয়েল হসপিটাল' স্থাপন করেন। ১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে গোয়ার পর্তুগিজ সরকার সেখানে বসবাসকারী সমস্ত খ্রিষ্টানদের পক্ষে পশ্চিমী চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেন।

shot on moto g⁸ plus
Prasenjit's photography

কোম্পানি অধিকৃত বাংলায় পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রচলনের পিছনে যে সমস্ত কারণ বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল সেগুলি হল, কলকাতা তথা বাংলার পরিবেশ ও জলবায়ু, বাংলার মড়ক সৃষ্টিকারী রোগব্যাধি, বিভিন্ন ধরনের মহামারী রোধের জন্য দেশীয় সনাতনী চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যর্থতা, ঔপনিবেশিক স্বার্থসুরক্ষা বিশেষত সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা, পাশ্চাত্যপন্থীদের তৎপরতা, উনিশ শতকের বাংলায় নবজাগরণের প্রভাব।

১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে জব চার্ণকের আগমনের পর থেকে কলকাতার জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এখানকার পরিবেশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছিল। কোম্পানির জনস্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তা জে. আর. মার্টিন জব চার্ণকের পছন্দে খুব একটা সন্তোষ প্রকাশ করেননি। তিনি তাঁর "Notes on Medical Topography of calcutta" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, "যে সমস্ত বাণিজ্যিক গোষ্ঠী বিদেশে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছে, তাদের মধ্যে ইংরেজরাই বাণিজ্যকেন্দ্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম সতর্কতা অবলম্বন করত এবং জব চার্ণক কর্তৃক কলকাতাকে মনোনয়ন একটি দুর্ঘটনা ছাড়া অন্য কিছুই নয়"। তিনি কলকাতার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও তা থেকে সৃষ্ট রোগব্যাধির কারণগুলিকে যেভাবে ভাগ করেছেন তা হল, বদ্ধ জলাশয়, জলনিকাশীর অভাব, নোংরা পরিবেশ ও অপরিশ্রুত পানীয়জল ইত্যাদি।

শুধুমাত্র কলকাতাই নয়, কলকাতার খুব কাছে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত হিজলীর জলবায়ু ও পরিবেশ যে ইউরোপীয়দের পক্ষে মোটেই স্বাস্থ্যকর ছিল না এবং সেখানকার মড়ক সৃষ্টিকারী রোগব্যাধির প্রকোপে বিভিন্ন ইউরোপীয় কর্মচারিরা যে শোচনীয়ভাবে অকাল মৃত্যুর শিকার হয়েছিল, তা উইলিয়ম হেজেসের ডাইরী থেকে জানা যায়। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "The mortality this years hath been very great, but more especially at this of Hidgley, which was not only in respect of what dyed there, but great numbers died afterwards through the disease they contracted there...." ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনও তাঁর ভারত ভ্রমণের পর বলেছিলেনঃ a more unhealthful place could not be chosen on all the river "। এছাড়া ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু ও অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা করে যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস বিভাগের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ এইচ. সিজারিষ্ট মন্তব্য করেছেন যে, India this is a country which by its mere geography presents many more and much more serious problems..."

কোম্পানির সঙ্গে ভারতে আগত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এদেশের জলবায়ু, পরিবেশ ও রোগব্যাধির প্রকৃতি ও চিকিৎসা সম্পর্কে ছিল একেবারে অনভিজ্ঞ এবং সংখ্যাতেও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। এছাড়া পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞান সেসময় বিশেষ উন্নত ছিল না। ফলে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তার কর্মচারিদের নিতান্ত প্রয়োজনবোধে এদেশীয় চিকিৎসাব্যবস্থা অনুসরণ করে চলার নির্দেশ দেয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসের গোড়ার দিকে এবং পরবর্তীকালের রোগব্যাধি, মহামারী ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সবরকম চিন্তাভাবনারই উদ্ভব হয়েছিল সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করেই। ভারতে কোম্পানির আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা ছিল এদেশীয় রোগ, ব্যাধি ও মহামারী। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে বুন্দেলখন্ডের পিন্ডারী ও মারাঠাশক্তির বিরুদ্ধে মোতায়েন করা সৈন্যদের অনেকেই কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিল এবং এক সপ্তাহে ৭৬৪ জনের পর্যন্ত মৃত্যু হয়। সমসাময়িক একটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, "প্রতিদিন, শ'য়ে শ'য়ে অসুস্থ সৈন্য ভূপতিত হচ্ছিল, মৃত ও মুমূর্ষু মানুষে রাস্তা ঢেকে যাচ্ছিল। কলেরার এই বিধ্বংসী আক্রমণ অব্যাহত ছিল ১৮৩১ সাল পর্যন্ত।" তাছাড়া একটি বিশেষ হিসেব থেকে জানা যায় যে, ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির অধীনে যত ইউরোপীয় সৈন্য ও অফিসার ছিল তাদের ছয় শতাংশের মৃত্যুর কারণ ছিল সরাসরি যুদ্ধ, বাকিদের মৃত্যুর কারণ ছিল বিভিন্ন ধরনের জ্বর, আমাশয়, উদরাময়, কলেরা ও যকৃতের অসুখ ইত্যাদি। একারণেই আর. এম. মার্টিন মন্তব্য করেছিলেন যে, "Diseases is the greatest enemy of the British soldiers"।

উনিশ শতকে বীজাণু তত্ত্ব বা 'germ Theory' আবিষ্কৃত হবার আগে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের যে প্রশ্নটা ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল তা হল, ইউরোপীয়দের পক্ষে কি গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব? কারণ গ্রীষ্মপ্রধান

দেশের জলবায়ু তাদের বসবাসের অযোগ্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগব্যধিগুলির কারণ হিসেবে তারা 'MIASMA' বা পূতিবাষ্পতত্ত্বকে দায়ী করত। J. Lind রচিত 'Essay on Diseases incident of Europeans in Hot Climates গ্রন্থে এই প্রশ্নটিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

ষোড়শ শতকের পর থেকেই পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে নতুন নতুন যে আবিষ্কার হয়েছিল তা মানুষকে অনেক সচেতন করে তুলেছিল। আঠার শতক থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ইংরেজি ভাষার সংস্পর্শে আসার ফলে ভারতবাসীর মনে যুক্তিবাদী অনুসন্ধানী মনোভাবের সৃষ্টি হয়, তারা প্রচলিত সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি দুর করে পাশ্চাত্যের যা কিছু ভাল ভারতবাসীর স্বার্থে তা প্রচলনের জন্য সরকারের কাছে বারবার আবেদন জানাতে থাকে। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বেসরকারিভাবে পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসরণ করে আসছিল।

পরিস্থিতির সঙ্গে সমতা রেখে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল প্রেসিডেন্সি হসপিটাল, ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে খোলা হয়েছিল 'বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিস', ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে চালু হল 'প্রেসিডেন্সি জেনারেল হসপিটাল', ১৭৯২-৯৩-এ স্থাপিত হল'নেটিভ হসপিটাল', ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপ থেকে আমদানী করা হল বসন্তের টীকা।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর তৎপরতা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল ইংরেজি ও ফরাসীদের মধ্যে সংঘটিত কর্ণাটকের যুদ্ধের সময় থেকে । এরপর পলাশীর যুদ্ধে ও বকসারের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে কোম্পানিকে আরও রাজ্য জয় ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে হয়। অথচ কোম্পানির সঙ্গে ভারতে আপাত চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ফলে সরকার ও এদেশী ব্যক্তিরাও এদেশীয় শিক্ষিত যুবকদের পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলার চিন্তাভাবনা শুরু করেন।

Public Health Policies

জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত আধুনিক ধারণাগুলি এদেশে প্রথম আমদানী করেছিল ইংরেজরা। মূলতঃ সেনাদের প্রয়োজনে ও ইউরোপীয় কর্মচারিদের স্বাস্থ্য সংকটকে কেন্দ্র করে এই ধারণার আমদানী হলেও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের খাতিরে ব্রিটেনের জনস্বাস্থ্য নীতির অনুকরণে ভারতেও এর বিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৭৫৭ সালে বাংলার সামরিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে বাংলায় কোম্পানির বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেলেও উনিশ শতক পর্যন্ত জনস্বাস্থ্য বিষয়ে কোম্পানির সরকার ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি একটি 'ইমপ্রুভমেন্ট কমিটি' গঠন করে তার উপর শহর ও নগরগুলির জনস্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব প্রদান করেন। কিন্তু এই কমিটি আশানুরূপ কাজ না করায় ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে এই দায়িত্ব 'লটারী কমিশন'কে দেওয়া হল।সে সময় লটারী কমিশন বিভিন্ন ধরনের লটারীর মাধ্যমে টাকাপয়সা সংগ্রহ করে শহর ও নগরের উন্নয়নে খরচ করত। ১৮১০ সালে মিউনিসিপ্যালিটির জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে খুটিয়ে দেখা ও সে বিষয়ে সুপারিশ করার দায়িত্ব দেওয়া হয় ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটরদের। কিন্তু প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাবে তাদের সুপারিশগুলি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। অথচ জলবায়ু ও পরিবেশগত কারণে বাংলা ছিল কলেরা, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, আমাশয় ও প্লেগ প্রভৃতি মড়ক সৃষ্টিকারী মারাত্মক রোগব্যাধিগুলির লীলাক্ষেত্র। অথচ এগুলির প্রতিরোধের আগাম সতর্কতা হিসাবে ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় কেবলমাত্র বসন্তের টিকা আনিয়ে ১১,১৬৬ জনকে টিকা দেওয়া ছাড়া ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় কিছুই করা হয়নি। ১৮১৯ সালে ম্যাজিস্ট্রেট, কালেকটর ও সার্জেনকে নিয়ে একটি কমিটি অব্ ইমপ্রুভমেন্ট গঠিত হয়েছিল। তখন থেকেই উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শ ও রিপোর্ট দেবার দায়িত্ব এই কমিটির উপর ন্যস্ত করা হল।

১৮৬১ সালে প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য একজন করে 'স্যানিটারী কমিশনার' নিয়োগ করা হয়। বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ১৮৮০-৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় কলেরায় ব্রিটিশ সৈন্যের মৃত্যুর হার নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় ব্যাপক শিল্পায়ন আরম্ভ হলে শিল্পাঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করে জনবসতি বাড়তে থাকে এবং বহু রেললাইন, সড়ক, জলাধার ও বাঁধ নির্মাণের ফলে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভীষণ অবনতি ঘটে। কোন কোন হিসাব অনুসারে ১৮৭১-

৮১ সালের মধ্যে বাংলায় লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করে। এর মধ্যে মেদিনীপুরে ও বর্ধমানে মৃতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮৫ হাজার ও দেড়লক্ষ। বাধ্য হয়ে সরকার ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে শহর ও শহরতলি, মেলা ও জনবহুল এলাকাগুলিকে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে। সেগুলিতে পরিশ্রুত পানীয়জল সরবরাহ, জল নিকাশীর ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করা, বাধ্যতামূলক টিকাদান এবং বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সরবরাহ শুরু করে। এই উদ্দেশ্যে ট্রেনিংপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী ছাড়াও দেশীয় চিকিৎসক, পোস্টমাস্টার পুলিশ এবং এমনকি স্কুল মাস্টারকে কাজে লাগান হলেও পরিস্থিতির আদৌ উন্নতি হয়নি।

বিশের শতকের বিশের দশকে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজকর্মের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে চলে যায় এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ১৯২০ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ জনস্বাস্থ্য বিভাগ খোলা হল। সামাজিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এই বিভাগ কিছু কিছু নতুন পদক্ষেপ নিলেও মহামারীর প্রকোপে মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হয়নি।

Status of Indigeneous Medicine

আঠার শতকের শেষভাগ বাংলার শাসনক্ষমতা লাভের পর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময়ের উপেক্ষা ও উদাসীনতার পরে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কোম্পানির সরকার এদেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির গুরুত্ব স্বীকার করে নিলেও বিশেষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। উনিশ শতকের বাংলায় গতানুগতিক ধারায় আয়ুর্বেদ চর্চা এগিয়ে চলেছিল। কবিরাজি শিক্ষা টোল, চতুষ্পাঠী, কিংবা গুরুগৃহে সম্পন্ন হত। আয়ুর্বেদ চর্চার প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল — নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, কলকাতা, শ্রীখন্ড, যশোহর, চট্টগ্রাম, চাঁদসী, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগনা ও নাটোর প্রভৃতি। বাংলার বিশিষ্ট কবিরাজদের মধ্যে ছিলেন : ভবানী প্রসাদ রায়, রামকান্ত সেন, নন্দকুমার সেন, মানিক রায়গুপ্ত, গঙ্গাধর রায়,গঙ্গাপ্রসাদ সেন, নীলাম্বর সেন, ভগবতী সেন, যামিনীভূষণ রায় প্রমুখ।

উনিশ শতকের প্রথমভাগে যখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হল সরকারি আনুকূল্যে তখন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার সম্ভাবনা বাতিল হয়ে গেলেও আয়ুর্বেদ চর্চা বন্ধ হয়নি। গঙ্গাধর রায় কলকাতা ছেড়ে মুর্শিদাবাদে গিয়ে এবং কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন কলকাতায় ব্যাপকভাবে আয়ুর্বেদচর্চা শুরু করলে বাংলাকে ঘিরে আয়ুর্বেদ জাগরণের প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হয়।

ধীরে ধীরে বাংলার আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ ও সমর্থকরা ব্যক্তিগত কিংবা যৌথ উদ্যোগে বহু আয়ুর্বেদ শিক্ষাকেন্দ্র ও আরোগ্য নিকেতন চালু করে, 'কবিরাজি' ওষুধের ব্যাপক উৎপাদনের ব্যবস্থা করে সরকারি উদাসীনতা ও পরোক্ষ বিরোধতার যোগ্য জবাব দিয়েছিল। ক্রমশঃ এই উদ্যোগ জাতীয়তাবাদী (স্বদেশী) আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে বিশের শতকের প্রথমভাগে আরও জোরদার হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে পন্ডিত ক্ষুদিরাম বিশারদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল 'বৈদ্যসমাজ' এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কবিরাজেরা আয়ুর্বেদের স্বার্থ রক্ষায় ছিলেন ভীষণভাবে তৎপর। এ প্রসঙ্গে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের 'সমাচার চন্দ্রিকায়' বলা হয়েছিল যে, "আমরা অবগত হইলাম যে, শ্রীযুত ক্ষুদিরাম বিশারদ যিনি পূর্বে সংস্কৃত কলেজের পন্ডিত ছিলেন, তিনি যত্নবান হইয়া উক্ত সভার সম্পাদকত্ব ভারগ্রহণ পূর্বক জোড়াসাঁকো নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র বসুজের দরুণ তৎসভা সংস্থাপিত করিয়াছেন। তথায় বহুবিধ কবিরাজ মহাশয় সমাগতা হইয়া সভাকরণ দ্বারা আয়ুর্বেদ পাঠ করিবেন। এক্ষণে অনেক বৈদ্য যথার্থরূপে ঔষধ ও কোন দ্রব্যের কী গুণ তা জ্ঞাত নহেন।

অনেকের মতে বৈদ্যসভা আয়ুর্বেদের উন্নতিতে ভীষণভাবে মনোযোগী হলেও তাদের রক্ষণশীল মনোভাব পরোক্ষভাবে আয়ুর্বেদেরই ক্ষতি করেছিল। কারণ, সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষার প্রশ্নে কে বা কারা চিকিৎসা করছে সেটা বড় কথা নয়, সঠিক চিকিৎসা হচ্ছে কিনা সেটাই বড় কথা। সে সময় ডাঃ সাদারল্যান্ড 'ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে' আয়ুর্বেদের সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ লিখলে 'সঞ্জীবনী'তার যোগ্য প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছিল যে, "যে প্রণালীর বয়স সহস্র বৎসর হইয়াছে, যাহার স্বার্থরক্ষায় কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেনি এই বার সাদারল্যান্ড প্রকাশ্যে ইহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা লে. ক. সাদারল্যান্ডকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, এই চিকিৎসা পদ্ধতি রাজনুকূল্য ব্যতিরেকে কেবল শ্রেষ্ঠতার জন্য সহস্র সহস্র বৎসর সগৌরবে জীবিত রহিয়াছে..."।

সম্ভবতঃ এটাই ছিল আয়ুর্বেদের সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রথম সংঘবদ্ধ লিখিত প্রতিবাদ। গঙ্গাধর রায় ও গঙ্গাপ্রসাদ সেন ছাড়া কলকাতার চরক চতুরানন ও দ্বারকানাথ, রাজেন্দ্র নারায়ণ বীরভূমে, নিবানুচর নন্দী রাজশাহীতে, কুশাগ্রামে বাংলার শেষ তান্ত্রিক হারাণচন্দ্র বসু, পাবনায় যদুনাথ, মুর্শিদাবাদে শ্রীচরণ, চট্টগ্রামে শ্যামচরণ, বারাণসীতে পরেশনাথ ও উমাচরণ, জয়পুরে লক্ষীরামস্বামী, নাগপুরে গোবর্দ্ধন শর্মা ছঙ্গানী, হরিদ্ধারে জ্ঞানেন্দ্র নাথ প্রভৃতি আয়ুর্বেদ সেবীরা বাংলা তথা ভরতে আয়ুর্বেদ চর্চায় জোয়ার নিয়ে আসেন।

আয়ুর্বেদ চর্চা বলতে সাধারণত আয়ুর্বেদ শিক্ষা, ঔষধ শিল্প, আয়ুর্বের্দ পত্র পত্রিকা ও বইপত্রের প্রকাশনা, চিকিৎসা ও গবেষণা কেন্দ্র, আয়ুর্বেদীয় ভেষজ চাষ এবং আয়ুর্বেদের উপর আস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ প্রভৃতিকে বোঝায়।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই কবিরাজরা নিজেদের বাড়িতেই প্রয়োজনীয় ঔষধ তৈরি করে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার নারকেলডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল 'মায়াপুর আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়' নামে একটি বড় আকারের আয়ুর্বেদীয় ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন এর স্থাপিত 'সি.কে. সেন এন্ড কোম্পানি' আয়ুর্বেদীয় ঔষুধপত্র এবং বইপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছিল। ১৮৮৪ স্থাপিত হয় এন. এন. সেন এন্ড কোম্পানি, ঢাকায় ১৯০১ এ স্থাপিত হয় শক্তি ঔষধালয় ও পরে সাধনা ঔষধালয়।

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই বিভিন্ন ধরনের আয়ুর্বেদীয় বইপত্র প্রকাশিত হচ্ছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল সংস্কৃত থেকে বঙ্গানুবাদ। এগুলির মধ্যে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'চিকিৎসার্ণব' প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের 'প্রাণকৃষ্ণ ঔষধাবলী', অম্বিকাচরণ ব্যানার্জীর 'সুশ্রুত', দুর্গাচরণ কবিরাজের 'গৌড়িয় ঔষধাবলী', সিদ্ধেশ্বর কবিরাজের 'দ্রব্যার্থ চন্দ্রিকা', মহেন্দ্রনাথ ঘোষালের 'আয়ুর্বেদোক্ত দ্রব্যগুণ বিধান', গুরুগোবিন্দ সেনের 'আয়ুবিজ্ঞান', ভুবনচন্দ্র বসাকের 'সন্ন্যাসী মতে আয়ুর্বেদ সংগ্রহ', প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ব্যবস্থাবলী', ভুবনচন্দ্র বসাকের 'আয়ুর্বেদ দ্রব্যগুণ বিধান' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলার বিভিন্ন জেলায় আয়ুর্বেদের উপর বহু বই প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ছিল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

বইপত্র ছাড়াও সেসময় শুরু হল নানারকম পত্রপত্রিকার প্রকাশনা। যেমন 'আয়ুর্বেদ সঞ্জীবনী ', 'চিকিৎসা সম্মিলনী', 'চিকিৎসা লহরী ধন্বন্তরী' 'চিকিৎসক' প্রভৃতি। যে সময় আয়ুবেদ শাস্ত্রের পত্রিকাগুলি নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় 'চিকিৎসা সম্মিলনী মন্তব্য করেছিল যে, "আয়ুর্বেদের উন্নতি কামনা করিয়া এখন একটি মাত্র পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন..."।

উনিশ শতকের আটের দশকে 'বড়বাজার গার্হস্থ্য সমাজ' দেশীয় ব্যক্তিদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রসম্মত উপায়ে স্বাস্থ্য রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য 'আয়ুর্বেদ সম্মত স্বাস্থ্য রক্ষা' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সেই প্রতিযোগিতায় সফল ব্যক্তিদের মধ্যে ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি তখনকার গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন।

উনিশ শতকের শেষ দিকে আয়ুর্বেদের উন্নতির উদ্দেশ্যে কবিরাজরা কলকাতায় আয়ুর্বেদ কলেজ, আয়ুর্বেদ হাসপাতাল, আয়ুর্বেদীয় গাছ গাছড়ার বাগান তৈরির আবেদন জানালেও সরকার সে বিষয়ে কোন সুবিচার করেননি। তবে তাই জন্য স্বদেশী উদ্যোগে কোন ভাটা পড়েনি। তৎকালীন বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন লিলুয়া স্টেশনের কাছে 'আদি আয়ুর্বেদ ভেষজ উদ্যান' নামে একটি ভেষজ উদ্যান তৈরি করেন। মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন ও কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানকে উন্নত করে তোলার চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তাঁর চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এগিয়ে আসেন কবিরাজ যামিনী ভূষণ রায় ও গণনাথ সেন। এছাড়াও এর বহু আগে কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন কলকাতায় ও আচার্য গঙ্গাধর রায় মুর্শিদাবাদে আয়ুর্বেদকে অ্যালোপ্যাথির সমান মর্যাদায় উন্নীত করে গেছেন। এর ফলে কবিরাজরা ডাক্তারদের সমান মর্যাদা ও পারিশ্রমিক পেতে শুরু করেন। তখন থেকেই বাংলায় আয়ুর্বেদ চর্চার যে দুটি ধারার সৃষ্টি হয়, তা বিভিন্নভাবে আয়ুর্বেদকে সমৃদ্ধ করে গেছে।

বিংশ শতকে আয়ুর্বেদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন সমসাময়িককালের স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 'অল ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক কংগ্রেস'। এই সংস্থার প্রধান দায়িত্ব ছিল আয়ুর্বেদের উন্নতির জন্য সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দেই 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদের' সভায় কলকাতায় একটি আয়ুর্বেদ কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এরপর এ বিষয়ে আলোচনার শেষে কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা

তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে গঠন করা হল 'আয়ুর্বেদ সভা'। এর সভাপতি এবং সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যথাক্রমে কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন এবং কবিরাজ গণনাথ সেনের উপর। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে আয়ুর্বেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আন্দোলনের সমর্থকরা সেসময় শুদ্ধপন্থী এবং মিশ্রপন্থী এই দুই মতাদর্শে বিভক্ত হয়ে গেলে এই আন্দোলন বিশেষ জোরদার হয়ে উঠতে পারে নি। তা সত্ত্বেও, ১৯১৬ সালে কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ', এরপর থেকে একে একে প্রতিষ্ঠিত হল, শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্র পীঠ, গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্বেদীয় কলেজ ও বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদীয় মহাবিদ্যালয়। বিদেশী ঔষুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হবার জন্য বিশের শতকরা প্রথম থেকেই বেশি করে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। সেগুলির স্বার্থরক্ষার জন্য ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত হল 'আয়ুর্বেদীয় মহামন্ডল'। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে বলা হল, "The conference is of the opinion that earnest and definite efforts should be made by the people of this country to further popularise schools, colleges and hospitals for instructions and treatment of indigeneous system". ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে গঠন করা হল'আয়ুর্বেদ সভা'। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে এই কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করে তাতে আয়ুর্বেদের পুণঃপ্রতিষ্ঠার কারণ ব্যাখ্যা করা হয় এবং এর উন্নতির জন্য কতগুলি সুপারিশ করা হয়। এছাড়া স্বদেশীর যুগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পন্ডিত মদনমোহন মালব্য, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও মতিলাল নেহেরু প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ যুব সমাজের কাছে এই বলে আহ্বান জানান যে, "You should study and revive this purely Indian system of medecine and establish its superiority over other systems in the world". অবশেষে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রাদেশিক জাতীয় সরকারে ভারতীয়েরা অংশগ্রহণের সুযোগ পেলে আয়ুর্বেদের উন্নতির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

Women and Western Medicine

মহিলারাও যাতে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষিতা হয়ে উঠতে পারে সেজন্যে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল। ভারতীয় নারীসমাজের সঙ্গে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে ভারতীয় নারী শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের হাতিয়ার হিসেবে পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাছাড়া ভারতবর্ষে নারীপুরুষের সম্পর্ক, লিঙ্গবৈষম্য, মহিলাদের বিরুদ্ধে চালু সামাজিক কুপ্রথা(যেমন পর্দাপ্রথা, বাল্যবিবাহ) এই বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের যে সমালোচনা ছিল মহিলাদের ভগ্নস্বাস্থ্য, চিকিৎসার অভাব বিষয়ক ধারণা সেই চালু মতবাদকে আরও জোরদার করে তুলেছিল। ভারতীয় মহিলাদের এই বিপন্ন অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এগিয়ে আসা যে দরকার সেই ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হয়েছিল। এব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল পাশ্চাত্যের মহিলাসমাজ।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তার বলি হয়েছিল কিছু কিছু পুরোনো কিন্তু মূল্যবান প্রতিষ্ঠান যা ভারতীয় নারীর স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভূমিকা পালিন করে এসেছিল। এই ক্ষতির বদলে ভারতীয় মহিলাদের পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান কী কী দিতে পেরেছিল? এক দিকে শিক্ষিতা মহিলাদের জন্য ডাক্তারী, নার্সিং প্রভৃতি পেশাগ্রহণের সুযোগ তৈরি করেছিল। তাছাড়া কিছুটা অবস্থাপন্ন ও শহুরে পরিবারের মহিলাদের সামনে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আগেকার কবিরাজী ও অন্য দেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতির পাশাপাশি পাশ্চত্য চিকিৎসা পদ্ধতির বিকল্প পন্থাকে উন্মুক্ত করেছিল।

ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসা (যাকে সাধারণভাবে 'অ্যালোপ্যাথিক' চিকিৎসা বলা হয়) এর সূত্রপাত ও প্রসারের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ব্রিটিশ সৈন্যদের স্বাস্থ্যরক্ষা। আপাতঃদৃষ্টিতে ভারতীয় মহিলাদের ব্যাধিকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে Contagious Diseases Act, ১৮৬৮ সালে গৃহীত হয়েছিল তারও মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে যৌনব্যাধির সংক্রমণ রোধ করা। এই আইনটি ১৮৬৬ তে ব্রিটেনে গৃহীত আইনের অনুসরণে রচিত হয়েছিল। উনিশ শতকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অসুস্থতা ও মৃত্যুর হার ছিল খুব বেশি এবং এর দুটি প্রধান কারণ ছিল ম্যালেরিয়া ও যৌনব্যাধি। অবিবাহিত ও পরিবারবিহীন সৈন্যদের পতিতা-সংসর্গ রোধ করা প্রায় অসম্ভব হওয়ায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ব্যাধি সংক্রমণের জন্য পতিতাসমাজকে দায়ী বলে চিহ্নিত করে এবং এই আইনের বলে যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত এই সন্দেহে যে কোন পতিতাকে ধরে এনে চিকিৎসা করা যেত। গবেষকদের মতে C. D.

Act যে শুধু মহিলাদের শরীরের উপরে রাষ্ট্রের একধরনের নিয়ন্ত্রণ ও অভিভাবকত্বকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল তাই নয়, সমাজের উপরে এর প্রভাব ছিল আরও সুদূরপ্রসারী কারণ 'ভদ্র' ও 'ইতর' শ্রেণীর মহিলার মধ্যে বিভেদের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। আগেকার নৈতিক ও অনৈতিকতার মাপকাঠির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রসূত ধারণার মানদন্ড অনুযায়ী সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রী শরীর ও ব্যাধিমুক্ত উচ্চশ্রেণীর শরীর এর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণের একটি দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ব্রিটেনে তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতার ফলে এই আইনটি রদ করা হয়েছিল। ১৮৮৬ সালের এই ভারতীয় আইন লুপ্ত করা হল ১৮৮৮তে। তবুও ভারতীয় মহিলা যৌনকর্মীদের উপরে ব্যাধিগ্রস্ততার অজুহাতে রাষ্ট্রীয় খবরদারি ও নির্যাতন কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়নি। ১৮৮৯ এ যে নতুন Military cantonments Act গৃহীত হয়েছিল তার কোনও কোনও ধারার বলে যৌনকর্মীদের তদারক ও চিকিৎসাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে তাদের নিগৃহীত করার উপায় থেকে গিয়েছিল।

১৮৬০ ও ৭০ এর দশকে বেসরকারি স্তরে ভারতীয় মহিলাদের কাছে পাশ্চাত্য চিকিৎসাকে পৌঁছে দেবার জন্য প্রথম কাজ শুরু করেন মহিলা খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকরা। মহিলা হাসপাতাল স্থাপন, পাশ্চাত্যচিকিৎসার প্রসার, ভারতীয় মেয়েদের ধাত্রীবিদ্যা ও নার্সিং শিক্ষা দেবার প্রকল্প এসমস্ত তাঁরা চালু করেছিলেন। আমেরিকা থেকে প্রথম আসেন Clara Swain ; ইংলন্ড থেকে Fanny Butter । একই সঙ্গে বিশিষ্ট বিদেশিনী মহিলা ডাক্তাররা অনুভব করছিলেন যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষিত পুরুষ ডাক্তাররা ভারতীয় মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব পর্দানশীন মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৮৫ তে Lady Dufferin স্থাপন করলেন Dufferin Fund বা "National Association for Supplying Female Medical Aid to the Women of India"। এর লক্ষ্য ছিল তিনটি মহিলাদের জন্য ডাক্তারী শিক্ষার ব্যবস্থা; মেয়েদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা এবং হাসপাতাল ও বাড়ীতে মহিলা নার্স এবং ধাত্রী সরবরাহ। এই লক্ষ্যগুলি পূরণের উদ্দেশ্যে মহিলা ছাত্রীদের জন্য ছাত্রীবৃত্তির প্রবর্তন, বিভিন্ন প্রদেশিক কমিটিগুলির মারফৎ মহিলাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান চালু ইত্যাদি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল।

Dufferin Fund এর মত প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আগে মোটামুটিভাবে দুটি ধারণা খুব প্রচার পেয়েছিল। এক, ভারতীয় মহিলাদের দেখ্‌ভাল এর দায়িত্ব পুরুষ সমাজ ঠিকভাবে পালন করে না এবং তাই এ দায়িত্ব বর্তেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর এবং দুই, পর্দানশীন ভারতীয় নারীদের সুচিকিৎসার (পড়ুন পাশ্চাত্যচিকিৎসা) জন্য মহিলাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে মনে করা হত যে ভারতীয় মহিলাদের তুলনায় ভারতে বসবাসকারী ইওরোপীয় মহিলারা ভারতের আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারার জন্য রোগাক্রান্ত ও ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের অধিকারিণী। কিন্তু উনিশের মাঝামাঝি থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে একটি আশ্চর্যজনক পরিবর্তন চোখে পড়ে। সেসময় থেকে ভারতের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারের একটি বিশেষ দিক ছিল ভারতীয় মহিলাদের দুর্দশাকে তুলে ধরা। বলা হত যে মহিলারা যেসব সামাজিক কুপ্রথার শিকার — যেমন 'সতী', পর্দাপ্রথা ইত্যাদি — তার জন্য ভারতীয় পুরুষসমাজ দায়ী। পর্দাপ্রথা ও বাল্যবিবাহকে মহিলাদের ভগ্নস্বাস্থ্য ও অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী করা হত। বলা হত যে পর্দাপ্রথার জন্য ভারতীয় মহিলারা কোন অনাত্মীয় পুরুষ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাতে পারে না বলে অকালব্যাধি ও অসময়ে মৃত্যুর তারা শিকার হয়। কিন্তু আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসক বা পুরুষ কবিরাজরা হিন্দুসমাজে অন্তঃপুরিকাদের চিকিৎসা করতেন। এছাড়া বহু প্রসিদ্ধ মহিলা কবিরাজও ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই ভেষজ চিকিৎসাকে অবৈজ্ঞানিক বলে হেয় করা শুরু হয়।

ভারতবর্ষে মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষা মারাত্মকভাবে অবহেলিত এবং এই কাজে অভারতীয়দের এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা আছে এই যুক্তি সাজিয়ে পরিবেশনের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদীরা দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছিল : এক, 'অগ্রসর' পাশ্চাত্য সভ্যতার 'অনগ্রসর' বর্বর প্রাচ্যকে সুশিক্ষিত সুসভ্য করে গড়ে তোলার আবশ্যিকতার কথা ব্যক্ত করে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠা করা এবং দুই, পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিপন্ন করা। ডাফরিন ফান্ড স্থাপন প্রকারান্তরে ভারতীয় চিকিৎসাকে অবৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণ করে শুধু তাই নয়, তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে চেয়েছিল। 'অ্যালোপ্যাথি' চিকিৎসাই যে বিজ্ঞাননির্ভর ও মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষার একমাত্র উপায় তা জোরদারভাবে ঘোষণা করা হয়। এভাবেই পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করে

সাম্রাজ্যবাদের সুদৃঢ়করণ ঘটানো হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ভারতীয় সমাজে পুরুষতান্ত্রিকতার মনোভাবের দ্বারা নারীর অবমাননার বর্বরোচিত আচরণ ও প্রথাকে পাশ্চাত্যের সভ্য ও অগ্রসর মানসিকতার বিপরীত বিন্দুতে স্থাপন করার দ্বারাও পাশ্চাত্যের অভিভাবকত্ব তথা সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করা হয়েছিল। এভাবেই ভারতে পুরুষ নারী সম্পর্কের মূল্যায়নে ও মহিলাদের সামাজিক অবস্থান বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভারতীয় মহিলাদের স্বাস্থ্য ও পাশ্চাত্যচিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তাভাবনা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পশ্চিমের মহিলাসমাজ সাম্রাজ্যবাদী এই মনোভাবের পোষণ ও বিস্তারে এক্ষেত্রে যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল তাও লক্ষ্য করার মত।

ডাফরিন ফান্ডের একটি বিচিত্র দিক হল এই ফান্ডের প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই পর্দাপ্রথাকে ভারতীয় মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল বলা হলেও এই ফান্ড কিন্তু পর্দানশীল মহিলাদের চিকিৎসার জন্যই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করত। অর্থাৎ, ভারতীয় সমাজের তথাকথিত বর্বর প্রথাকে শুধু যে স্বীকৃতি জানানো হল তাই নয়, এর ধারাবাহিকতাকেও চালু রাখা হয়েছিল। নাহলে শুধুমাত্র মহিলা ডাক্তাররাই চিকিৎসক হতে পারতেন না। আসলে ভারতীয় মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে ডাফরিন ফান্ড বিরাট কিছু সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও এর কাজকর্মের দ্বারা ব্রিটিশ মহিলা ডাক্তারদের যে ভারতে এসে চাকুরী লাভের সুযোগ অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিল সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

এবারে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে শিক্ষিতা কয়েকজন ভারতীয় মহিলার কথা আলোচনা করে আমরা ভারতীয় নারীসমাজের সঙ্গে পাশ্চাত্য চিকৎসা পদ্ধতির পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি আর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা করব। ভারতে মহিলাদের জন্য মেডিক্যাল শিক্ষার দরজা খুলে দেওয়ার দাবী ও প্রচেষ্ঠা শুরু হয়েছিল ১৮৭০ এর দশকে। বস্তুতপক্ষে সরকারি সমর্থন ও শিক্ষিত ভারতীয়দের উৎসাহ ও আগ্রহের ফলেই মহিলাদের ডিগ্রিধারী ডাক্তার হবার সুযোগ এসেছিল। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ডাক্তাররা কিন্তু মেয়েদের ডাক্তারী পড়ার বিরোধী ছিলেন। এঁদের বক্তব্য ছিল যে মহিলারা ধাত্রী বিদ্যা ও নার্সিং পড়ার উপযুক্ত, ডাক্তার হবার অনুপযুক্ত। কিন্তু তাঁদের এই বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করেই প্রথম মেয়েদের ডাক্তারী শিক্ষা চালু হল মাদ্রাজে। বাংলাদেশে ব্রাহ্মসমাজের তরুণরা মেয়েদের মেডিক্যাল শিক্ষার জন্য দাবী তুলেছিলেন। ১৮৮৩ তে কাদম্বিনী বসু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেন। এর কিছু পরেই তাঁর বিবাহ হল প্রখ্যাত ব্রাহ্ম সংস্কারক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে। ১৮৮৬ তে কাদম্বিনী গ্রাজুয়েট অব বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ উপাধি লাভ করেন। কাদম্বিনী ভারতের সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষিতা পেশাগত যোগ্যতার অধিকারিণী মহিলা চিকিৎসক। সফল ও যোগ্য চিকিৎসক রূপে তিনি প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

১৮৮৮-তে কাদম্বিনী লেডি ডাফরিন হাসপাতালে চাকরীতে যোগ দেন। তাঁর মাসিক বেতন ছিল তিনশ টাকা। এছাড়াও তাঁর ডাক্তারী পসরা ছিল খুবই জমজমাট। কাদম্বিনীকে যেমন সাহায্য করেছিলেন তাঁর স্বামী দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর মত অগ্রসর মনোভাবের পুরুষরা, তেমনি রক্ষণশীল সমাজের একাংশ তাঁর অনন্যপূর্ব কাজকর্ম, পেশাগত সাফল্য কোন কিছুকেই মেনে নিতে পারেননি। এই জন্যই রক্ষণশীল বঙ্গবাসী পত্রিকায় ১৮৯১ এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কাদম্বিনীকে Whore বলে সম্বোধন করে কাদা ছোঁড়া হয়েছিল। দ্বারকানাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, নীলরতন সরকার প্রমুখ এই অপমানের জবাবে বঙ্গবাসী পত্রিকা ও তার সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। সম্পাদক মহেশ চন্দ্র পাল দোষী সাব্যস্ত হন। তাঁর ১০০ টাকা জরিমানা ধার্য হয় ও ৬ মাসের জেল। বাঙালী হিন্দু রক্ষণশীলরা মহিলাদের স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন ভাল চোখে দেখতেন না। তাঁরা ভাবতেন যে 'অন্দর' বা 'অন্তঃপুর' ও বাইরের মধ্যে বিভাজন রেখা মেনে মেয়েরা পেশার সূত্রে প্রবেশ করলে তাঁদের 'সতীত্ব', 'পতিব্রতা' পবিত্রতা এসব অনুসরণে বিঘ্ন ঘটবে। সম্ভবত তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন এই ভেবে যে যদি মেয়েরা কাদম্বিনীর উদাহরণে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীন পেশাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্য এগিয়ে আসে এবং সফল হয় তাহলে নারীর উপর অনুশাসন শিথিল হবে; পিতৃতান্ত্রিকতার দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে। নিজের সাহস ও স্বামীর উৎসাহে কাদম্বিনী অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে পেয়েছিলেন। ১৮৯৩ এ তিনি এডিনবরায় যান উচ্চতর শিক্ষার জন্য ও সফল হয়ে ফিরে আসেন।

সাহসিনী কাদম্বিনী সমাজে নিন্দার পাত্রী হয়েছিলেন, আর কাজের জায়গায় হয়েছিলেন বর্ণবৈষম্যের শিকার।১৮৮৫র পরে

Dufferin Fund এর উদ্যোগে বহু হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারী চালু হয়েছিল।কিন্তু এসব জায়গায় চাকরিতে নিয়োগের সময় পক্ষপাতিত্ব দেখানো হত শ্বেতাঙ্গিনী ডাক্তারদের। কাদম্বিনীর ক্ষেত্রেও এরকম হয়েছিল। ১৮৯১ অস্থায়ী পদে কর্মরতা কাদম্বিনীকে বঞ্চিত করে মেমসাহেব ডাক্তারকে স্থায়ীভাবে চাকরিতে নিযুক্ত করা হল। কাদম্বিনীর অভিযোগ ছিল যে ভারতীয় মহিলাদের উপযুক্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালের উঁচু পদগুলিতে তাঁদের বাদ দিয়ে সাদা চামড়ার ডাক্তারদের নিয়োগ করা হচ্ছে। এর ফলে ভারতীয় মহিলা ডাক্তাররা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পাচ্ছেন না। আর একজন মহিলা ডাক্তারের নাম হৈমবতী সেন। তাঁর আত্মজীবনীর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী। Geraldine Forbes এর লেখা ভূমিকাসমৃদ্ধ এই অনুবাদ উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম দিকের বাঙালী সমাজের পটভূমিতে একজন মহিলার জীবনে ঘরে ও বাইরে সংগ্রাম, পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান শেখা, ডাক্তারী পেশা গ্রহণ ইত্যাদি নানা দিক সম্বন্ধে আমাদের জানায়। সেই সঙ্গে তোলে বেশ কিছু প্রশ্ন।

হৈমবতী মিত্র জন্মেছিলেন(১৮৬৬) খুলনার এক সম্পন্ন জমিদার পরিবারে। দশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়, কিন্তুএক বছরের মধ্যে তাঁর স্বামী মারা গেলেন। বাবা মায়ের মৃত্যু, শ্বশুর বাড়ীতে আত্মীয়দের দুর্ব্যবহার এইসব বিপর্যয়ের ফলে তিনি বেনারসে চলে যান ও একটি ছোট স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৮০-র দশকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের তরফ থেকে বিধবাদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে শুনে হৈমবতী কলকাতায় এলেন এবং ১৮৯০-এ তাঁর বিবাহ হল ব্রাহ্ম প্রচারক কুঞ্জবিহারী সেন এর সঙ্গে। ১৮৯১-এ হৈমবতী ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হলেন VLMS (Vernacular Licentiate in Medicine and Surgery) ডিগ্রী অর্জনের জন্য। হৈমবতী যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন এবং ১৮৯৪ -এ যোগ দিলেন হুগলির ডাফরিন মহিলা হাসপাতালে 'হস্‌পিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট' পদে।

চাকুরী জীবনে হৈমবতী নিগ্রহের শিকার হয়েছিল। পদাধিকার বলে Assistant Surgeon ও Civil Surgeon তাঁর পেশাগত আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। Assistant Surgeon বদ্রিকানাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রতি দুরব্যবহার ও অশভোন আচরণ করেন। Civil Surgeon-এর কাছে অভিযোগ জানিয়ে এর কোন প্রতিকার হয়নি। হৈমবতী চাকরির পাশাপাশি ব্যক্তিগত পসারও জমিয়ে ছিলেন। তাঁর উপার্জনে সংসার চলত, অথচ রোজগার হীন স্বামীর নানা খামখেয়ালিপনা, সাংসারিক প্রভুত্ব তাকে সহ্য করত হত। পাঁচ সন্তানের জননী হৈমবতী ক্যানসার রোগে মারা যান ১৯৩৩-এ।

প্রশ্ন তোলা যায় যে, ব্রিটিশ ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা শেখা ও ডাক্তারী পেশা গ্রহণ এই সব মহিলাদের (ও এঁদের মত অন্যান্য অনেকের) জীবনে ও বৃহত্তর সমাজে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। কাদম্বিনীর ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কথা আগেই আলোচনা হয়েছে। পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছিল যে মহিলা ডাক্তাররা যে ধরনের জাতিবৈষম্যের শিকার হচ্ছিলেন দেশীয় পত্র পত্রিকায় তার সমালোচনা ও প্রতিবাদ জানানো হচ্ছিল। অর্থাৎ ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদে এটি একটি।

অন্যদিকে হৈমবতী ও তাঁর মত অনেকের জীবনে এই পেশা নিঃসন্দেহে একধরনের নিরাপত্তা ও অবলম্বন তৈরি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান করেছিল। তাঁরা হয়ত পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদে সামিল হননি, কিন্তু সেযুগে নিজেদের কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁরা একটি সামাজিক বৃত্ত বা পরিসর তৈরি করতে পেরেছিলেন যা ভবিষ্যতের নারীবাদী এবং বৃহত্তর অর্থে মানবতাবাদী ভাবধারাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। আবার এও বলতে হয় যে ঔপনিবেশিক শিক্ষার ফসল হলেও তাঁরা অনেক দিক থেকে ঔপনিবেশিকতাবাদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে প্রকারান্তরে অতিক্রম করেছিলেন, কারণ হৈমবতী-র মত মহিলা ডাক্তাররা দেশজ পদ্ধতিকে বাহবা দিয়েছিলেন এবং চিকিৎসার সময় সেই পদ্ধতির সাহায্যও নিতেন।

Scientific Institutions

১৮২০-র দশকের গোড়ার দিকে সরকার পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল। William Ward ১৮২০ সালেই ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যদিও এই প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি। কলকাতাসহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সামারিক ও বেসামরিক হাসপাত্রল চালু করেছিল যেখানে

shot on moto g⁸ plus

Dufferin Fund এর উদ্যোগে বহু হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারী চালু হয়েছিল।কিন্তু এসব জায়গায় চাকরিতে নিয়োগের সময় পক্ষপাতিত্ব দেখানো হত শ্বেতাঙ্গিনী ডাক্তারদের। কাদম্বিনীর ক্ষেত্রেও এরকম হয়েছিল। ১৮৯১ অস্থায়ী পদে কর্মরতা কাদম্বিনীকে বঞ্চিত করে মেমসাহেব ডাক্তারকে স্থায়ীভাবে চাকরিতে নিযুক্ত করা হল। কাদম্বিনীর অভিযোগ ছিল যে ভারতীয় মহিলাদের উপযুক্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালের উঁচু পদগুলিতে তাঁদের বাদ দিয়ে সাদা চামড়ার ডাক্তারদের নিয়োগ করা হচ্ছে। এর ফলে ভারতীয় মহিলা ডাক্তাররা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পাচ্ছেন না। আর একজন মহিলা ডাক্তারের নাম হৈমবতী সেন। তাঁর আত্মজীবনীর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী। Geraldine Forbes এর লেখা ভূমিকাসমৃদ্ধ এই অনুবাদ উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম দিকের বাঙালী সমাজের পটভূমিতে একজন মহিলার জীবনে ঘরে ও বাইরে সংগ্রাম, পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান শেখা, ডাক্তারী পেশা গ্রহণ ইত্যাদি নানা দিক সম্বন্ধে আমাদের জানায়। সেই সঙ্গে তোলে বেশ কিছু প্রশ্ন।

হৈমবতী মিত্র জন্মেছিলেন(১৮৬৬) খুলনার এক সম্পন্ন জমিদার পরিবারে। দশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়, কিন্তুএক বছরের মধ্যে তাঁর স্বামী মারা গেলেন। বাবা মায়ের মৃত্যু, শ্বশুর বাড়ীতে আত্মীয়দের দুর্ব্যবহার এইসব বিপর্যয়ের ফলে তিনি বেনারসে চলে যান ও একটি ছোট স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৮০-র দশকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের তরফ থেকে বিধবাদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে শুনে হৈমবতী কলকাতায় এলেন এবং ১৮৯০-এ তাঁর বিবাহ হল ব্রাহ্ম প্রচারক কুঞ্জবিহারী সেন এর সঙ্গে। ১৮৯১-এ হৈমবতী ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হলেন VLMS (Vernacular Licentiate in Medicine and Surgery) ডিগ্রী অর্জনের জন্য। হৈমবতী যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন এবং ১৮৯৪ -এ যোগ দিলেন হুগলির ডাফ্‌রিন মহিলা হাসপাতালে 'হস্‌পিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট' পদে।

চাকুরী জীবনে হৈমবতী নিগ্রহের শিকার হয়েছিল। পদাধিকার বলে Assistant Surgeon ও Civil Surgeon তাঁর পেশাগত আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। Assistant Surgeon বদ্রিকানাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রতি দুরব্যবহার ও অশভোন আচরণ করেন। Civil Surgeon-এর কাছে অভিযোগ জানিয়ে এর কোন প্রতিকার হয়নি। হৈমবতী চাকরির পাশাপাশি ব্যক্তিগত পসারও জমিয়ে ছিলেন। তাঁর উপার্জনে সংসার চলত, অথচ রোজগার হীন স্বামীর নানা খামখেয়ালিপনা, সাংসারিক প্রভূত্ব তাকে সহ্য করত হত। পাঁচ সন্তানের জননী হৈমবতী ক্যানসার রোগে মারা যান ১৯৩৩-এ।

প্রশ্ন তোলা যায় যে, ব্রিটিশ ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা শেখা ও ডাক্তারী পেশা গ্রহণ এই সব মহিলাদের (ও এঁদের মত অন্যান্য অনেকের) জীবনে ও বৃহত্তর সমাজে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। কাদম্বিনীর ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কথা আগেই আলোচনা হয়েছে। পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছিল যে মহিলা ডাক্তাররা যে ধরনের জাতিবৈষম্যের শিকার হচ্ছিলেন দেশীয় পত্র পত্রিকায় তার সমালোচনা ও প্রতিবাদ জানানো হচ্ছিল। অর্থাৎ ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদে এটি একটি।

অন্যদিকে হৈমবতী ও তাঁর মত অনেকের জীবনে এই পেশা নিঃসন্দেহে একধরনের নিরাপত্তা ও অবলম্বন তৈরি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান করেছিল। তাঁরা হয়ত পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদে সামিল হননি, কিন্তু সেযুগে নিজেদের কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁরা একটি সামাজিক বৃত্ত বা পরিসর তৈরি করতে পেরেছিলেন যা ভবিষ্যতের নারীবাদী এবং বৃহত্তর অর্থে মানবতাবাদী ভাবধারাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। আবার এও বলতে হয় যে ঔপনিবেশিক শিক্ষার ফসল হলেও তাঁরা অনেক দিক থেকে ঔপনিবেশিকতাবাদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে প্রকারান্তরে অতিক্রম করেছিলেন, কারণ হৈমবতী-র মত মহিলা ডাক্তাররা দেশজ পদ্ধতিকে বাহবা দিয়েছিলেন এবং চিকিৎসার সময় সেই পদ্ধতির সাহায্যও নিতেন।

Scientific Institutions

১৮২০-র দশকের গোড়ার দিকে সরকার পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল। William Ward ১৮২০ সালেই ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যদিও এই প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি। কলকাতাসহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সামারিক ও বেসামরিক হাসপাতল চালু করেছিল যেখানে

ভারতীয়দের নিয়োগ করা হত। এই 'native doctor'-দের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠান চালু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে Medical Board ১৮২২-এ সরকারের কাছে দেশীয় ডাক্তারদের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল চালু করার প্রস্তাব দিয়েছিল। ১৮২২-এর Native Medical Institution প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল যার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন Dr. James Jameson। এখানে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীদের ভর্তি করা হত তবে এর জন্য হিন্দুস্থানী জানা আবশ্যক ছিল। ২৪ জন ছাত্রকে প্রথমবার ভর্তি করা হয়েছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের হাসপাতাল ও ইস্ট ইন্ডিয়া কেম্পানীর ডিস্‌পনসারীতে এদের শিক্ষা দেওয়া হত। শারীরবিদ্যা, ঔষধিবিদ্যা, ও অন্যান্য বিষয়ের উপর হিন্দুস্থানীতে বক্তৃতা দেওয়া হত। শবব্যবচ্ছেদের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ছোটখাটো প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ অবশ্য করা হত।

১৮২৩ এ Dr. Jameson-এর মৃত্যুর পর Dr. Breton তত্ত্বাবধায়কের ভার গ্রহণ করেন ও ১৮৩০-এ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। এইসময় পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যতম সমস্যা ছিল পাঠ্য বই। তা সমাধানের জন্য নানারকম চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল। এই সমস্যার অংশিক সমাধানের জন্য N. M. I. এর তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ ব্রেটন দেশীয় ভাষায় বেশ কিছু চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই প্রকাশ করেন। তখনকার দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেই এই বইগুলি সম্পর্কে উচ্চ অভিমত প্রকাশ করেন। রাজা রামমোহন রায় ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দের ৪ মে ও ২৪ সেপ্টেম্বর ব্রেটনের কাছে ওই বইগুলি সম্পর্কে দুটি পত্র লেখেন। প্রথম পত্রে তিনি নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে বলেন যে, এদেশে দুর্বোধ্য বিষয় নিয়ে যে সব বই প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে ওই বইগুলি দেশীয় ব্যক্তিদের জ্ঞান আহরণে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে। দ্বিতীয় পত্রে তিনি বলেন, ওই বইগুলি দেশীয় ব্যক্তিদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ।

রাজা রাধাকান্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কলেরা বিষয়ক বইটিকে সার্থক ও মঙ্গলদায়ক বলে মতপ্রকাশ করে ব্রেটনকে একটি পত্র লিখেছিলেন। কলকাতা ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ব্যক্তিদের ওই বইয়ের নির্দেশ মান্য করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এর ফলে দেশীয় ব্যক্তিদের প্রাণ যদি রক্ষা পায় তাহলে সেটাই হবে ব্রেটনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ।

আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শ্রীরামপুর কলেজেও সেই সময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছিল। ফেলিক্স কেরির সম্পাদনায় ১৮২০ সালে বিদ্যাহারাবলী'র প্রথম খন্ড 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা' প্রকাশিত হয়।

১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে থেকে সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতা মাদ্রাসাতেও মেডিকেল শিক্ষা শুরু হয়। ১৮২৬-এর জুন মাসে General Committee of Public Instruction সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী ও মাদ্রাসা কমিটির কাছ থেকে আবেদন পত্র পেয়েছিল, যেখানে সরকারের কাছে তাদের প্রতিষ্ঠানে মেডিকেল শিক্ষা প্রচলনের অনুরোধ করা হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী Captain W. Price General Committee-কে জানিয়েছিলেন যে কলেজের ছজন ছাত্র এবং বাইরের ১২জন বৈদ্য বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি মেডিকেল শিক্ষা প্রচলনের প্রস্তাব করেন যার ফলে তারা চিকিৎসাবিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে জীবিকা অর্জনে সক্ষম হবে। General Committee-এই প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং এভাবেই এই দুই প্রতিষ্ঠানে চালু করা হল মেডিকেল ক্লাস, যার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলেন Dr. Tytler। সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ, বিশেষতঃ শুশ্রুত সংহিতা ও চরকসংহিতা পাঠ্যগ্রন্থ ছিল ও ইওরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হত। অন্যদিকে কলকাতা মাদ্রাসায় ইউনানী চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা মেডিকেল শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের পড়াশোনা শুরু হওয়ায় পাঠ্য বইয়ের সমস্যা নতুন করে শুরু হয়। তার সমাধানের জন্যেও বিভিন্ন পরিকল্পনা রচনাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়েছিল। ১৮২৮ সালের ১৮ এপ্রিল জন টাইট্‌লার শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক এইচ, এইচ, উইলসনকে একটি পত্রে জানান যে 'এডিনবার্গ মেডিক্যাল ডিক্‌শনারি থেকে হৃৎপিন্ডের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র রচনা তিনি আরবীতে অনুবাদ করেছেন এবং আশাও করেন তা কর্তৃপক্ষের কাজে লাগবে।

নভেম্বর মাসে হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের পাঠ্য ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত বইয়ের অভাব পূরণের জন্য শিক্ষা পরিষদের কাছে একটি পরিকল্পনা তিনি দাখিল করেছিলেন। ওই পত্র থেকে জানা যায় সেই সময়ে সংস্কৃত কলেজে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য মাত্র ৮-১০খানি 'হুপার্‌স অ্যানাটমিস্টস ভাডেমেক্‌ম' (Hoopers Anatomists Vademecum) ছিল। তাও ভিক্ষা এবং ধার করে

shot on moto g⁸ plus
Prasenjit's photography

জোগাড় করা। ইংলন্ড থেকে বই অধিক সংখ্যায় জোগাড় করতে হলে সময়ের প্রয়োজন ছিল। তাই বইয়ের অভাব মেটানোর জন্য টাইটলার দুটি উপায়ের কথা বলেন। একটি হল চিকিৎসাবিজ্ঞান ও গণিতের জন্য একপ্রস্থ বই প্রকাশ করা। দ্বিতীয় হল ইউরোপ থেকে বই সংগ্রহ। এই দুটি পরিকল্পনার মধ্যে প্রথমটিকে তিনি বেশি প্রাধান্য দেন কারণ এটা সস্তা এবং এখানে প্রকাশিত বই দেশীয় ছাত্রদের পক্ষে বোঝা সহজ হবে।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে Dr. Hooper-এর 'Anatomists Vademecum', Thompson এর 'Conspectus of the pharmacopoeig Fyfe-এর 'Manual of Chemistry', Conquest এর 'Outline of Midwifery', Twining ও Smith-এর Tropical Diseases, Dr. Thomas, এর 'Plague' এই বইগুলি সঠিক মানের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে কাজে লাগত। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত Hooper এর গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৩২ সালের একটি সরকারি পত্র থেকে জানা যায় যে সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে যুক্ত ৩০টি শয্যার একটি ছোট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৮৩৩-এ J. Grant, সংস্কৃত কলেজের তত্ত্বাবধায়ক ও শিক্ষক এই হাসপাতালের প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদনে হাসপাতালের ৩০টি শয্যার কথা উল্লেখ করেন এবং ১৮৩২ এর শেষে ১৫৮ জন বহিরাগত রোগীর চিকিৎসা হয়েছে বলে জানান। শল্যচিকিৎসা ও ঔষধিবিজ্ঞানের বিভিন্ন ইংরেজ পুস্তকের ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। এইসব অনুবাদ গ্রন্থের পাশাপাশি ভরতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কেও পড়ানো হত। এই বছরেই সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্বেদের ছাত্রদের সংস্কৃততে শিক্ষা দেবার জন্য আরও শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। মাদ্রাসায় ছাত্রদের ইউনানী ও আরবী চিকিৎসকদের কাজের সঙ্গে পরিচিত করানো হত।

১৮৩৩ সালে William Bentinck-Public Instruction Committee গঠন করে তার উপরে N. M. I স্থাপনের সময় থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রগতির ব্যাপারে অনুসন্ধানের ভার দেন ও এই শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করার দায়িত্ব দেন। এই কমিটির মতে N. M. I-এর ব্যবস্থাপনা ছিল কিছুটা অসংগঠিত, পড়ানো, প্রশিক্ষণের সময়, পরীক্ষা ব্যবস্থা সবই ত্রুটিপূর্ণ। হাতে কলমে শরীরবিদ্যা শেখানোর ব্যবস্থার অভাবের সমালোচনা করা হয়েছিল। এই ত্রুটি দূর করার উপায়ের বিষয়ে কমিটির সদস্যদের মধ্যে শিক্ষাদান দেশীয় ভাষায় হবে নাকি ইংরেজিতে এনিয়ে Anglicist ও Orientalist দের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। Orientalist দের মধ্যে ছিলেন William Bentinck, T. B. Macaulay, Surgeon John Grant, Tyller ১৮০৪ এর ৩ জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক মেজর ট্রয়ারের কাছে লেখা একটি পত্রে উল্লেখ করেন যে সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত চিকিৎসাশাস্ত্রের বইতে অনেক মূল্যবান তথ্য আছে। তা নষ্ট হওয়া দুঃখের বিষয়। চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত বিভাগের সংস্কৃত বইগুলির ইংরেজিতে এবং বাংলায় অনুবাদ না হওয়া পর্যন্ত সংস্কৃত ক্লাসকে বন্ধ করে দেওয়ার তিনি বিরোধিতা করেন।

শেষ পর্যন্ত Anglicist দের অভিমতকেই গ্রহণ করে কমিটির Report এ লেখা হয়েছিল " a knowledge of the English Langnage we consider as a *sine Due non*, because that language combines within itself the circle of all the sciences and incalculable wealth of printed works and illustrations, circumstances which give it obvious advantages over Oriental languages, in which are only to be found the crudest element of science, or the most irrational Substitutes for it".

২৮ জানুয়ারি, ১৮৩৫-এ গভর্নর জেনারেল এর নির্দেশনামা অনুযায়ী N. M. I ও সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসার চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে নতুন একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার কথাও ঘোষণা করা হল। N. M. I-এর শিক্ষকদের মধ্যে শুধুমাত্র পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত নতুন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হলেন।

নতুন মেডিকেল কলেজের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হল Dr. Mountford James Bramley (Feb. 1, 1835)। কলকাতা মেডিকেল কলেজে বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে ১৪ থেকে ২০ বছর বয়সের ছাত্রদের ভর্তির সুযোগ দেওয়া হত। ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য সরকারের তরফ থেকে প্রত্যেককে ৭ টাকা বৃত্তি দেওয়া হত। বেন্টিঙ্কের নির্দেশে বলা হয়েছিল ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা দেওয়া হবে।

shot on moto g⁸ plus
Prasenjit's photography

কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপনে ব্রিটিশ ভারতে চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার ইতিহাসের একটি পর্যায়ের সমাপ্তি সূচিত করেছিল যে পর্যায়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের সংমিশ্রণ প্রচলিত ছিল। ১৮২২ থেকে ১৮৩৫- এর মধ্যে N. M. I ১৬৬ জন দেশীয় ডাক্তারকে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে শিক্ষা দিয়েছিল। ১৮৩৯ সালে সরকার বাংলা প্রেসিডেন্সিতে ৩০৫ জন দেশীয় ডাক্তার নিয়োগ করেছিল যার মধ্যে ১২৪ জন N. M. I এর ছাত্র ছিল।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের পাঠ্যবিষয় ছিল যথেষ্ট বিস্তারিত। Anatomy, Physiology, Chemistry, Physics, Medical Botany, Materia Medica এবং Pharmacology পড়ানো হত। ১৮৩৬-এর ২৮ অক্টোবর ৪ জন মেডিকেল কলেজে শবব্যবচ্ছেদ করেন প্রথমবার, যার মধ্যে মধুসূদন গুপ্তও ছিলেন।

১৮৩৮-এর ৩০ অক্টোবর প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল। সরকারের কাছে পেশ করা প্রতিবেদনে পরীক্ষক উমাচরণ শেঠ, রাজকৃষ্ণ দে, দ্বারকানাথ গুপ্ত ও নবীনচন্দ্র মিত্রের বিশেষ প্রশংসা করেন।

১৮৩৭ -এর ১৯ জানুয়ারিতে অধ্যক্ষ Bramley-র মৃত্যুর পরে কলেজের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সরকার কিছু কিছু পরিবর্তন আনেন। General Committee of Public Instruction-এর কাছে লেখা (১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৭) একটি পত্রে H. T. Prinsep জানান D. Hare কে Secretary নিয়োগ করা হয়েছে এবং কলেজের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটি Council of Professors গঠন করা হয়েছে। তবে ১৮৪১-৪২-এর প্রতিবেদনে G C P I উল্লেখ করে যে নতুন ব্যবস্থার ফলে দায়িত্ব অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। ডেভিড হেয়ার ১৮৪১-এ Secretary পদ থেকে ইস্তফা দেন তবে কলেজ কাউন্সিল-এর সদস্যরূপে তিনি অন্তর্ভুক্ত হন। ১৮৪২-এ তাঁর মৃত্যুর ফলে কলেজ-এর ক্ষতি হয়। তবে উল্লেখযোগ্য ভারতীয়দের মধ্যে অনেকে যেমন রামগোপাল ঘোষ, রুস্তমজী কাওয়াসজী, রামকমল সেন, কৃষ্ণনাথ রায় ও সর্বোপরি দ্বারকানাথ ঠাকুর মেডিকেল কলেজকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন।

১৮৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে Lord Auckland তাঁর ভাষণে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে C. M. C-কে তিনি মনে করেন সরকার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিলেত থেকে ঘুরে এসে ১৮৪৪ সাল নাগাদ দ্বারকানাথ ঘোষণা করেন যে তিনি ডাক্তারী উচ্চশিক্ষার্থে ইংলন্ডে যেতে ইচ্ছুক দুজন ছাত্রের ব্যয়ভার গ্রহণ করবেন।১৮৪৫-এ Professor Gooddeve চারজন ভারতীয় ছাত্রকে ইংলন্ডে মেডিকেল শিক্ষার্থে নিয়ে যান। এঁরা কৃতিত্বের সঙ্গে সেদেশে College of Surgeons এর diploma অর্জন করেন।

১৮৪৮-এর ছাত্রদের সাহায্যার্থে মেডিকেল কলেজের কাছে Feverhospital গড়ে তোলা হয়। ১৮৫৪-৫৫ সালের Council of Educations-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে এর ফলে মেডিকেল শিক্ষার প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে মেডিকেল শিক্ষার আধুনিকীকরণের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রাথমিকভাবে ৪০ জন ছাত্রকে নিয়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান শুরু হয়েছিল। পন্ডিত মধুসূদনগুপ্ত এর প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট ও শল্য বিভাগের প্রধান এবং শিবচন্দ্র কর্মকারকে ভেষজ বিভাগ ও প্রসন্নকুমার মিত্রকে চিকিৎসাবিদ্যা বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হল। পাঠক্রম হিসেবে ভেষজবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও শল্যবিদ্যা বিষয়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পঠন পাঠন শুরু হল।

মেডিক্যাল কলেজের বাংলা ভাষার স্কুলে ছাত্রভর্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে সেকালের সংবাদপত্রগুলির মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' এই বিভাগ খোলার ফলে বহু চিকিৎসক তৈরির সম্ভাবনা ও তার দ্বারা এদেশের উপকারের সম্ভাবনার কথা বলেছিল।তবে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' মন্তব্য করে যে 'মেডিক্যাল কলেজে বঙ্গীয় ভাষায় ইংরাজি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের নতুন পরিকল্পনা সংস্থাপিত হইবেক। তদুপলক্ষে অনেক দূরবর্তী প্রদেশ হইতে ভূরি ভূরি ব্যক্তি ওই বিদ্যায় শিক্ষা হইয়া আগমন করাতে অনুমান করা গিয়াছিল যে মফঃস্বলের চিকিৎসার দুর্বলতা এবার দূরীভূত হইবে কিন্তু সম্প্রতি ঐ সকল বিদ্যার্থীদের নিযুক্তিকরণ বিষয়ে যে প্রকার পরীক্ষা হইবার কথা শুনা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় আপাতত অধিক বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইতে পরিবেন না।'

প্রায় ৩০৯ জনের ভর্তির পরীক্ষা নিয়ে মাত্র ৪০ জনকে বাংলা ক্লাসে ভর্তি করা হল। এদের বয়ঃসীমা ১৮-২৫এর মধ্যে

shot on moto g plus
Prasenjit's photography

সীমাবদ্ধ করা হল এবং পাঠক্রমের মেয়াদ নির্ধারিত হল দু-বছর। তবে বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে মেডিক্যাল কলেজে বাংলা বিভাগ শুরু হলেও বাংলায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব, শ্রেণীকক্ষের অভাব, শিক্ষকদের বক্তৃতার উপর শুধুমাত্র নির্ভরশীলতা এসবের ফলে বাংলা বিভাগের ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষিত ছাত্রদের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব হয়নি। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজের দুটি দেশীয় ভাষায় ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৮২৩ জন। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট পূর্ববাংলার জন্য ঢাকায়, আসামের জন্য ডিব্রুগড়ে বা গৌহাটিতে, উড়িষ্যার জন্য কটকে এবং বিহারের জন্য পাটনায় মেডিক্যাল স্কুল খোলার কথা বলে। সরকারি আমলারাও একই উদ্দেশ্যে বাংলার প্রধান প্রধান শহরে একটি করে মেডিক্যাল স্কুল খোলার পরামর্শ দেয়।

শিয়ালদহের মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে দেশীয় ভাষায় স্কুল স্থানান্তরিত করা হয় এবং ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় ও পাটনায় একটি করে দেশীয় ভাষায় স্কুল খোলা হয়। এছাড়া ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের হিন্দুস্থানী ভাষার ক্লাস আগ্রা ও লাহোরে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সিংহলী ভাষার ক্লাস মেডিক্যাল কলেজেই থেকে যায়।

১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এতদিনে এদেশীয় প্রজারা ইংরেজি ভাষা মোটামুটিভাবে রপ্ত করতে পারায় ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে দেশীয় ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞানচর্চা সরকারি ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮৮৭-৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত মেডিক্যাল কলেজের একটি রিপোর্টে বলা হল যে, মেডিক্যাল কলেজ তার ৫৩টি সেশন শেষ করেছে। বিগত ৪৫ বছরে যে ১,০৬৯ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে ২৬ জন সিংহলী, ২৬৪ জন হসপিটাল এপ্রেন্টিস, ৬ জন বর্মিজ, ৭৭৩ জন বাঙালী ছিল।

মেডিক্যাল কলেজের পাশেই School of Tropical Medicine- এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল ১৯১৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। লিওনার্ড রজার্স বহু প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করে চাঁদা আদায় করেছিলেন। চিকিৎসক কৈলাসচন্দ্র বসুও তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

১৯২০ সালে ট্রপিক্যাল স্কুলের গবেষণাগারের কাজ শুরু হয়েছিল এবং ১৯২১ সালে স্কুলে ছাত্রভর্তি শুরু হয়েছিল। এর ডিরেক্টর ও গবেষকরা প্রত্যেক বিভাগে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এর প্রথম দিকের ডিরেক্টররা ছিলেন ঃ

J. W. D. Megaw (১৯২১-১৯২৮), H. W. Acton (১৯২৮-১৯৩৩), R. Knowles (১৯৩৩-১৯৩৫), R. N. Chopra (১৯৩৫-১৯৪১), L. E. Napier (১৯৪১-১৯৪৩), B. M. Dasgupta (১৯৪৩-১৯৪৫)।

এর প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর রামনাথ চোপরাকে আধুনিক ভারতের ভেষজ বিজ্ঞানের জনক বলা যায়। তিনি তৈরি করেন একটি গবেষক গোষ্ঠী। প্রায় পাঁচশো প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি ট্রপিক্যাল স্কুলে এবং মেডিকেল কলেজে ভেষজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯৩২ সালে ট্রপিক্যাল স্কুলের উল্টোদিকে 'রক্‌ফেলার ফাউন্ডেশনে'র পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয়েছিল 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এন্ড পাবলিক হেল্‌থ।' একদল গবেষক গোষ্ঠী এখানে নিষ্ঠাভরে গবেষণা করতে শুরু করেন। এখানকার গবেষণার বিষয়বস্তু জনস্বাস্থ্য। এই প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ছিলেন ডাঃ রামবিহারী লাল - এপিডেমিওলজি বিভাগের অধ্যাপক। এপিডেমিক ড্রপসি রোগের কারণ তিনি আবিষ্কার করেন।

shot on moto g⁸ plus
Prasenjit's photography

HV¡ fs-m ¢e-jÀ¡š² fËnÀ…¢ml Ešl -cJu¡ k¡-hz

1) Cø C¢äu¡ -L¡Çf¡e£l Bj-m h¡wm¡-a f¢ÕQj£ ¢h‘¡-el Bjc¡e£ -Le Hhw ¢Li¡-h Ll¡ q-u¢Rm ?
2) ¢hË¢Vnk¤-N 19 na-Ll h¡wm¡l Seü¡ÙÛÉ J ¢Q¢Lvp¡ e£¢a ¢Ll©f ¢Rm ?
3) Kf¢e-h¢nL k¤-N h¡wm¡l Bu¤-hÑ¢cL ¢Q¢Lvp¡ fÜ¢al Jfl B-m¡Qe¡ Llz ¢Li¡-h Hl Eæ¢a p¡de q-u¢Rm ?
4) Kf¢e-h¢nL k¤-N h¡wm¡l ¢h‘¡e p¡de¡l -L¾cÊ…¢ml ¢hL¡n ¢Li¡-h q-u¢Rm a¡ -cM¡Jz